অনুষ্টুপ

শারদীয় ২০১৪

অ নু ষ্টু প

সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

৪৯ বর্ষ ১ম সংখ্যা

শা র দী য় ১৪২১

সূ চি

প ত্রি কা র ক থা

স ম্পা দ কী য়

ক বি তা : শঙ্খ ঘোষ

প্র ব ন্ধ

অরিন্দম চক্রবর্তী : প্রেমপথে সব বাধা/১

দীপেশ চক্রবর্তী : পিতা-পুত্র সম্বাদ : পারিবারিক চিঠিপত্রে যদুনাথ সরকার/২৫

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : 'হরিশ মুখুজ্জেকে বাঁচাতে হবে'/৩৫

সৌরীন ভট্টাচার্য : সতীশচন্দ্রের দেশভাবনা/৪২

স্বপন চক্রবর্তী : নৈঃশব্দ্যের কাল/৫২

মৈত্রীশ ঘটক : সব অসাম্য নয় সমান/৭৮

প্রদীপ বসু : খাদ্যরুচি স্বাদজ্ঞান/৯৯

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : 'সংহতি' : নতুন করে পড়া/১২৩

আশীষ লাহিড়ী : বিজ্ঞান-প্রচারক ও বিজ্ঞান-দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর/১৩৫

প্রসাদরঞ্জন রায় : কেশকর্তন, শোভাবর্ধন, অঙ্গমর্দন এবং .../১৫৫

পলাশ বরন পাল : কল্পবিজ্ঞান/১৭০

হিরণ মিত্র : ভিন্ন ছবি, ভিন্ন দর্শন/১৮৩

প্রবাল দাশগুপ্ত : বাংলা বাক্যে গোরের গেরো/১৯৮

অত্রি মুখোপাধ্যায় : মহাভারতের কিছু কালিক সমস্যা/২০৮

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় : খালেদ চৌধুরী : স্মৃতির গল্প/২২৪

স্বাতী ভট্টাচার্য : রাজনীতির ভাষা/২৩৩

শাশ্বতী ঘোষ : গোষ্ঠীর ভিতর থেকে পরিবর্তন?/২৪২

মোহিত রায় : ভগীরথ এসেছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ায়/২৫৯

দীপক গোস্বামী : পরশুরামের 'জাবালি' : পাণ্ডুলিপির রূপান্তর ও পাঠান্তর/২৭০

সোমেশ্বর ভৌমিক : মির্জা গালিবের কৈফিয়ত/২৮৬
গৌতম নিয়োগী : এক ইতিহাসবিদ প্রসঙ্গে/৩০১
রাজকুমার চক্রবর্তী : স্তালিন-লেনিন নিন্দা, ইতিহাসের পুনর্বিচার ও সোভিয়েত ব্যবস্থার পতন/৩০৯

ক বি তা

পবিত্র মুখোপাধ্যায়/৩৩৩, রাহুল পুরকায়স্থ/৩৩৪, বৃন্দা সেন/৩৩৫, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়/৩৩৭, সুধীর দত্ত/৩৩৮, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়/৩৩৯/, সুব্রত রুদ্র/৩১১, নির্মল হালদার/৩৪৩, প্রশান্ত ভট্টাচার্য/৩৪৪

ক্রো ড় প ত্র ১ : রবীন্দ্রনাথ

অমিয় দেব : 'জীবনস্মৃতি'-র 'আমি'/৩৪৭
শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের গান : একটি ব্যক্তিগত প্রতিবেদন/৩৬২
সন্দীপন সেন : রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু বাঙালি জাতীয়তাবাদ/৩৮৪
রণময় সরকার : না, কাদম্বরী দেবীর কোনো সুইসাইড-নোট নেই/৪৫০

গ ল্প

অভিজিৎ সেন : মহামহাবারুণী/৪৬৫
অমর মিত্র : হাড় ও মাংস/৪৮৪
স্বপ্নময় চক্রবর্তী : আত্মঘাতীর চুল/৪৯৩
ভগীরথ মিশ্র : হে জনগণ/৫০২
নলিনী বেরা : 'হি ল্ তি কিঁ উ র‍্যা'/৫২১

ক বি তা

স্রোতস্বিনী চট্টোপাধ্যায়/৫৩৩, তাপস রায়/৫৩৪, রাতুল দেববর্মণ/৫৩৫, গৌতম হাজরা/৫৩৬, রজতকান্তি সিংহচৌধুরী/৫৩৭, সুব্রত ছাটুই/৫৩৮, সৌগত চট্টোপাধ্যায়/৫৩৯, সুমন গুণ/৫৪০, অসিত দাস/৫৪১, অলোক সেন/৫৪২, জয়নাল আবেদিন/৫৪৩, কানাইলাল জানা/৫৪৪

ক্রো ড় প ত্র ২

এক নাস্তিক বৃদ্ধের জবানবন্দি : পরমেশ আচার্য/৫৪৭

গ ল্প

বিশ্বজিৎ রায় : ছিন্নমস্তা/৬১৭
কুলদা রায় : দুধকুমারের ঐরাবত/৬৪০
পূরবী বসু : দিনের শেষে/৬৫৯

শমীক ঘোষ : এনকাউন্টার/৬৬৬
অনিরুদ্ধ রাহা : অন্তরাল/৬৭৬
অনিল ঘোষ : বাঘাচাঁদের নাম পর্ব/৬৯৪
হাসানআল আব্দুল্লাহ : বিজলি/৭০৮

ক্রোড়পত্র ৩ : সাক্ষাৎকার

মৃণাল সেন
আমিই একমাত্র ভারতীয় বন্ধু মার্কেজের যে প্রথম অসুস্থতার খবরটা পেয়েছিল
কথা বলেছেন : অদ্রীশ বিশ্বাস/৭১৫
অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার : সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
কথা বলেছেন অদ্রীশ বিশ্বাস/৭২০
ইতিহাসকে জানা একটা বড়ো কাজ
সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
সাক্ষাৎকার নিয়েছেন : মলয় রক্ষিত/৭৩৭

ক্রোড়পত্র ৪

ফিরে দেখা : তরুণ সেন/৭৬৫

ক্রোড়পত্র ৫ : আসাম

অমিতাভ রায় : আবারও আহোমরাজের খোঁজে/৮০৫
মুক্তি চৌধুরী : আসামে নারীমুক্তি আন্দোলন : 'সূর্যপ্রভ চন্দ্রপ্রভা'/৮৪৫

ক্রোড়পত্র ৬

অক্তাভিও পাজ : সম্পাদনা : মালবিকা ভট্টাচার্য
মালবিকা ভট্টাচার্য : শতবর্ষে ওক্তাভিও পাজ/৮৬১
শুক্তি রায় : একাকীত্বের আবর্ত থেকে বহুত্বের বিমুক্তি : ওক্তাভিও পাজ/৮৭১
সোনালী দত্ত : একটি ঐতিহাসিক ইস্তফা এবং বিদ্রোহী ওক্তাভিও পাজ/৮৮২
বর্তমানের সন্ধান : ওক্তাভিও পাজ-এর ১৯৯০ সালের নোবেল বক্তৃতা /৮৯৪
ওক্তাভিও পাজ-এর কবিতা/৯০৮
দেবিকা বসু : কবি ওক্তাভিও পাজ : একটি অনন্য জীবন/৯২০
ওক্তাভিও পাজ-এর গ্রন্থপঞ্জি/৯২৬

আমার ডায়েরী থেকে : নাট্যাচার্যের সান্নিধ্যে

মুখবন্ধ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য : মলয় রক্ষিত/৯৩১
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার ডায়েরী থেকে : নাট্যাচার্যের সান্নিধ্যে/৯৩৬

সব অসাম্য নয় সমান

মৈত্রীশ ঘটক

১। অধরা অসাম্য

বেয়াড়া কতগুলো প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি।

ক। আপনি কি মনে করেন যেকোন প্রতিযোগিতায় সব অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ফলাফল সমান হওয়া উচিত, বা ফলাফল আলাদা হলেও, পুরস্কারের অর্থ বা সম্মানমূল্য সমান হওয়া উচিত? “আমরা সবাই জয়ী আমাদের এই জয়ীর জয়োৎসবে” বলে যাতে গান গাইতে গাইতে প্রতিযোগীরা বাড়ি ফিরতে পারবে, সফল প্রতিযোগীর হাতে পুরস্কারের ট্রফি আর ব্যর্থ প্রতিযোগীর শুকনো মুখ আর চোখের কোণে চিকচিকে জলের আভাস আর আমাদের দেখতে হবেনা (এই বিশ্বকাপে ব্রাজিলের জার্মানির কাছে হারার পরে ব্রাজিল সমর্থকদের প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই মনে আছে)। কেউ যদি বেশি ভালো খেলে, সেটা দর্শকেরা বেশি উপভোগ করতেই পারেন এবং তার জন্যে সে বেশি প্রশংসা পেতেই পারে, কিন্তু পুরস্কার বা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির মাধ্যমে জেতা এবং হারার মধ্যে বৈষম্য তৈরি করার প্রয়োজন কি? যতই হোক, দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম কয়েকজনের মধ্যে তো সময়ের ফারাক তো এক সেকেন্ডের অতি-ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের বেশি হয়না ।

খ। আপনি কি মনে করেন প্রখ্যাত কোন লেখকের কিছু লেখা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে তুলনায় অনামা লেখকদের মধ্যে বিলি করে তাঁদের নামে ছাপানো উচিত? কিম্বা, নিয়ম করে দেওয়া উচিত তিনি অন্যদের থেকে বেশি লিখতে পারবেননা বা বেশি লিখতে চাইলে তাঁকে আর্থিক বা শ্রমের মাধ্যমে জরিমানা দিতে হবে ? ভাবছেন তো, এটা কিরকম বিদঘুটে প্রস্তাব হল! কিন্তু খ্যাতির জায়গায় যদি আয় ভাবি, আয়-করের ভূমিকা অন্তত কারো কারোর মতে তো একই রকম - যিনি উদ্যোগ, ক্ষমতা এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে বেশি অর্জন করতে সক্ষম, তাঁকে বেশি কর দিতে হয়। আরো দুএকটা উদাহরণ আলোচনা করা যাক। অঙ্কে যে ছাত্র খুব ভালো, বার্ষিক পরীক্ষায় তার জন্যে অন্যদের থেকে যদি কম সময় বা অঙ্কে যে কাঁচা তার জন্যে বেশি সময় ধার্য করা হয়? অথবা, সময় একই রেখে পরীক্ষার প্রশ্ন কতটা শক্ত হবে তা যদি ছাত্রদের পারদর্শিতার ওপর ভিত্তি করা হয় বা একই ভুলের জন্যে ভালো ছাত্রর বেশি নম্বর কেটে নেওয়া হয়? স্কুলের ছাত্রদের কথাই যখন হচ্ছে, আরেকটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরুন একটি ছাত্রের মা ও বাবা উচ্চশিক্ষিত এবং সন্ধ্যেবেলা তাঁরা ছেলে বা মেয়ের পড়াশুনো নিয়ে অনেকটা সময় দেন। এই ছাত্র তার সহপাঠীদের তুলনায় অনেকটা সুবিধা পাবে। তাহলে কি

তুলনায় স্বল্পশিক্ষিত পরিবারের ছাত্রদের বাড়িতে এই ছাত্রটির মা বা বাবাকে বাধ্যতামূলকভাবে পড়াশুনো দেখাতে বাধ্য করা উচিত, বা এই আপাত-সুবিধাসম্পন্ন ছাত্রের পরীক্ষার ফলের মূল্যায়ন আরও শক্ত মাপকাঠিতে করা উচিত?

গ। রূপবান পুরুষ বা রুপসী নারীদের যদি বেশি কর দিতে বাধ্য করা হয়, এবং সেই অর্থ অন্যদের মধ্যে যদি বণ্টন করে দেওয়া হয়, কেমন হয়? যতই হোক সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র বলে তো একটা কথাই আছে। এই প্রসঙ্গে একটা পরিচিত গানের কলি মনে পড়ে যেতে পারে, "আর তোমরা যাকে করছ বিয়ে, আমিও তাকে চাই।" বিয়ের ব্যাপারটা খুব গোলমেলে। ধরা যাক বিবাহযোগ্য সমস্ত ছেলে এবং মেয়েকে তাদের কোনও একটি যোগ্যতার ভিত্তিতে (যেমন, কে কত দূর লেখাপড়া জানে বা কে কতটা আকর্ষক) ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে ফেলা হল। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাই হল বিপরীত লিঙ্গের সবচেয়ে আকর্ষক মানুষটিকে বিয়ে করতে চাওয়া। কিন্তু, চাইলেই তো আর হয় না, সবচেয়ে আকর্ষক মেয়েটি সবচেয়ে আকর্ষক ছেলেটিকেই বিয়ে করবে। পরিভাষায় একে বলা হয় অ্যাসর্টেটিভ ম্যাচিং বা সমতুল্য সমন্বয়। চন্দ্রবিন্দুর জনপ্রিয় এই গানের আবেগটি তাই আমাদের স্পর্শ করলেও, বাস্তবের খাতিরে বলতেই হয়, "কোন চান্স নেইরে, ভাই"। [১] ঠিক আছে, হয়তো এই উদাহরণটা একটু বেশিই অবাস্তব হয়ে গেল। যতই হোক সৌন্দর্য বা আকর্ষণক্ষমতার কোন নৈর্ব্যক্তিক মান হয়না। কিন্তু মানুষের শারীরিক, মানসিক, এবং চারিত্রিক অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাদের জীবনে সুখ-দুঃখ সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ধারণ করায় বড় ভূমিকা পালন করে, অথচ প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে এই উপাদানগুলো সবাই সমানভাবে পায়না। যে সপ্রতিভ বা মিশুকে সে বন্ধুমহলে বেশি জনপ্রিয় হয়। যার বংশধারার কারণে স্বাস্থ্য ভালো সে বেশিদিন সক্ষম থাকে এবং দীর্ঘায়ু হয়। যার স্বভাব শান্ত বা ধৈর্য বেশি, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার অধিকতর সুখী হবার সম্ভাবনা। এই ধরণের সব বৈশিষ্ট নিয়ে মানুষে মানুষে যে বৈষম্য, সেগুলো কমাবার জন্যে কি কোন নীতি অবলম্বন করা উচিত অথবা সম্ভব? এই উদাহরণ গুলো হয়ত একটু "চেরাপুঞ্জির থেকে, একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে" ধরণের চিন্তার মত শোনাচ্ছে, কিন্তু অসাম্য নিয়ে আলোচনায় শুধু আয় বা সম্পদের কথা ভাবলে তা অন্তত যুক্তির দিক থেকে বড় বেশি সঙ্কীর্ণ তা আশা করি তর্কের খাতিরে মেনে নেবেন।

ভাবছেন তো, যে উদাহরণগুলো একটু ডানপেশে হয়ে গেল? একটু অপেক্ষা করুন। তার আগে, এই যে তিন ধরণের উদাহরণ দিলাম, সেগুলো নিয়ে বিশেষ থেকে একটু সাধারণে গিয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রথমত, আমাদের ঠিক করতে হবে আমরা অসাম্যের (inequality), না কি বঞ্চনার (deprivation) বিরুদ্ধে? কেউ অন্যদের থেকে ভালো করছে বা ভালো আছে সেটা সমস্যা, না কেউ অন্যদের থেকে খারাপ করছে বা খারাপ আছে সেটা নিয়েই আমাদের মাথাব্যথা? সবাই যদি ভালো থাকে কিন্তু কেউ কেউ ভীষণ ভালো থাকে তাহলে কি আমাদের কোন আপত্তি আছে, না কি "কার ঘরে প্রদীপ জ্বলেনি, কার বাঁচার অন্ন মেলেনি, কার নেই আশ্রয় বর্ষায়, দিন কাটে ভাগ্যের ভরসায়" তাকে সাহায্য করতে হবে, এটাই হল আমাদের মূল লক্ষ্য?

দ্বিতীয়ত, সাম্য-অসাম্যের আলোচনা অধিকাংশ সময় আর্থিক সূচকের (আয়, সম্পদ, ব্যয়) মধ্যেই আবদ্ধ থাকি। কিন্তু জীবনযাত্রার মান অনেক উপাদানের ওপর নির্ভর করে, তার মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক সম্মান, নিরাপত্তা বোধ, নাগরিক অধিকার আছে, এবং ইদানীং অনেক সমীক্ষায় সুখ বা জীবনযাত্রার মান নিয়ে সার্বিক তৃপ্তিবোধের (life satisfaction) ওপরেও তথ্য আহরণ করা হয়। [২] তাই সাম্য-অসাম্যের আলোচনায় এই সূচক গুলো নিয়ে মানুষে মানুষে যে বৈষম্য তা এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। আর এগুলোর ক্ষেত্রে অসাম্যই হোক আর বঞ্চনা, আয় বা আর্থিক সম্পদের ক্ষেত্রে পুনর্বণ্টনের মত সেগুলোর প্রতিকার করা আরও শক্ত।

তৃতীয়ত, আমাদের ভাবতে হবে যে আমরা ফলাফলের অসাম্যের বিরুদ্ধে না সুযোগের অসাম্যের বিরুদ্ধে। এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। ফলাফল যদি শুধু পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে, তাহলে ফলাফলের অসাম্যের বিরুদ্ধে খুব একটা কিছু বলা মুশকিল। যে পরিশ্রম বেশি করেছে, তার আয় (বা যশ) বেশি হবে, এটা নিয়ে আপত্তি করার কোন যুক্তিসম্মত কারণ নেই। সুযোগের অসাম্য থাকলে ব্যাপারটা আলাদা। এ ক্ষেত্রে ভেবে দেখতে হবে, একই সুযোগ পেয়ে (যেমন একই পরিবারে দুই ভাই বা বোন) যদি ফলাফল আলাদা হয়, সেটা নিয়ে আমাদের সমস্যা, না কি দুজন সমান সুযোগ পাচ্ছেনা এবং তাই প্রতিযোগিতার ময়দানটা অসম, এটাই আমাদের বিচলিত করে?

এই সুযোগ বনাম ফলাফলের অসাম্যের ব্যাপারটা আরেকটু তলিয়ে ভাবা যাক। জীবনযাত্রার মানের যে কোন মাত্রা নিয়েই ভাবিনা কেন (আয় বা জীবন নিয়ে তৃপ্তিবোধ), অধিকতর সফল বা সুখী হবার পেছনে যে উপাদানগুলোর ভূমিকা আছে, তাদের আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি - পরিবেশ (সামাজিক-অর্থনৈতিক-পারিবারিক), ব্যক্তিগত দক্ষতা বা গুণাবলী, নিজস্ব প্রচেষ্টা, এবং এসবের বাইরে আর যত যদৃচ্ছ (random) উপাদান আছে, যাদের একত্র করে আমরা চলতি ভাষায় ভাগ্য বলতে পারি।

বাকি সব উপাদানগুলো এক রেখে, যে সহায়ক পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে, সে আর্থিক বা সামাজিক বা পারিবারিক যে দিক থেকেই হোক, তার সফল হবার সুযোগ যে সহায়ক পরিবেশ পায়নি, তার থেকে বেশি। যেমন, দরিদ্র পরিবারে জন্মের কারণে সুযোগের অভাবে যে প্রতিভার যথাযথ বিকাশ হতে পারেনা, এর উদাহরণ আমাদের চারপাশে অজস্র। একইভাবে, বাকি সব এক উপাদান এক রেখে যার দক্ষতা (যেমন, খেলোয়াড় বা লেখকের ক্ষেত্রে প্রতিভা) বা কোন গুণ বেশি (যেমন, সৌন্দর্য বা স্বাস্থ্য) সে সাফল্যের প্রাসঙ্গিক নিরিখে (আয়, যশ, সুখ) বেশি সফল হবে। আর, সব কিছু সহায়ক হলেও, পরিশ্রম বা উদ্যোগ না থাকলে, সাফল্য আয়ত্ত হবেনা, এ তো আমরা ছোটবেলা থেকে মা-বাবা-শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে শুনে আসছি। ভাগ্যের মধ্যে এমন সব উপাদান রাখছি যার ওপর কারোর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই এবং বাকি উপাদানগুলির সাথে তাদের কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। একজন প্রতিভাবান মানুষ যথেষ্ট সহায়ক পরিবেশে বড় হয়ে এবং নিজে যথেষ্ট পরিশ্রম করেও সফল না হতে পারেন, ভাগ্য সহায় না হলে। দুর্ভাগ্যের উদাহরণ পরীক্ষার আগের দিন জ্বর হওয়া বা দুর্ঘটনায় পড়া, এবং সৌভাগ্যের সুপরিচিত উদাহরণ হল ঠিক সময়ে ঠিক স্থানে উপস্থিত থাকতে পারা।

প্রস্তাবিত শ্রেণীবিভাগের পক্ষে যুক্তি হল, প্রথমে একজন ব্যক্তির সাফল্যে বা জীবনযাত্রার মানে তার নিজের ভূমিকা কতটা আর বহির্ভূত উপাদানগুলোর ভূমিকা কতটা এটা আলাদা করে নিলে অসাম্যের প্রতিকারের সম্ভাব্য পথ আছে কি না, আর থাকলে সেটা কি, এগুলো নিয়ে ভাবতে সুবিধে হয়। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, ফলাফলের অসাম্যে একজন ব্যক্তির নিজস্ব দায়িত্ব কতটা সেটাকে বাকি উপাদানগুলো থেকে আলাদা করা উচিত। নিজের ভূমিকার মধ্যে দক্ষতা এবং উদ্যোগের প্রভাব আলাদা করা উচিত, কারণ একটা হল জন্মসূত্রে পাওয়া, অর্জিত নয়, আরেকটা হল নিজস্ব উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফল, যার কমবেশির দায় ব্যক্তির ওপরে বর্তায় । চর্চার ফলে দক্ষতা বাড়তে পারে, সেক্ষেত্রে দক্ষতা বলতে আমরা স্বাভাবিক দক্ষতার কথা ভাবব। আর বহির্ভূত উপাদানগুলোর মধ্যে, যাদের নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়, এবং নিয়ন্ত্রণ করার কথা ভাবা যেতে পারে (তা বাস্তবসম্মত বা কাম্য হোক বা না হোক) তাদের সাথে সব হিসেবের বাইরে যে সব উপাদান, যাকে আমরা ভাগ্য বলছি, তাদের আলাদা করা উচিত।

একথা ঠিক, যে এই চারটে উপাদানগুলোকে সব সময়ে আলাদা করা যায়না। যেমন, কেউ কেউ মনে করবেন প্রতিভাও সৌভাগ্যের উদাহরণ - প্রকৃতির নিজস্ব লটারি আর বংশগতির প্রভাব। অথবা, সাফল্যের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও পরিশ্রমের ভূমিকাকে সেইভাবে আলাদা করা যায়না। সেইরকম, ভাগ্য সচরাচর উদ্যমীদেরই সহায় হয়। এই জটিলতাগুলো প্রাসঙ্গিক এবং কিছুক্ষেত্রে এর ফলে আমাদের সিদ্ধান্ত একটু আলাদাও হতে পারে। যেমন, সত্যি যদি আমরা ভাবি প্রতিভা এমন কোন সম্পদ নয় যার মূল্য তার মালিকের ন্যায্যত প্রাপ্য, নেহাতই

ভাগ্যের উদাহরণ, তাহলে জমি-জমার মত প্রতিভার ওপরেও কর বসানর কথা ভাবা যেতে পারে, যতই তা অবাস্তব (বা অন্যায্য) শোনাক। আমাদের প্রস্তাবিত এই শ্রেনীবিভাগের পক্ষে যুক্তি হল নেহাতই আলোচনার সুবিধা, আর কিছু না।

এবার ফিরে আসি গোড়ায় উত্থাপিত প্রশ্নগুলোতে। ভাবা যাক, এই ধরণের যে সব বৈষম্য, সেগুলো কোন নীতির মাধ্যমে কমাবার চেষ্টা করা উচিত কি না ? সেই সব নীতি কি নির্দিষ্ট রূপ নেবে, বা এইরকম নীতির কথা ভাবা আদৌ বাস্তবসম্মত কিনা সেটা আপাতত ভাবছিনা। এখন কে এই নীতি প্রবর্তন করবে, তার নিজস্ব অবস্থার ওপরে তার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করতে পারে। আপনি যদি জানেন আপনি "সফল" বা "সম্পন্ন" দের দলে, তাহলে আপনার নিজস্ব স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে ইচ্ছে নাই করতে পারে। তখন আপনার মনে হবে, এই আয় তো আমার পরিশ্রম বা মেধার ফল, বা এই সম্পদ তো আমার পূর্বপুরুষের পরিশ্রম ও সঞ্চয়ের ফল, এর ওপর বেশি হারে কর আরোপ করা তো অন্যায়। সেইরকম আপনি যদি "ব্যর্থ" বা "বঞ্চিত"দের দলে, আপনার উল্টোটা মনে হতেই পারে - ধনীর ধন হল অন্যায় সুবিধা ভোগ করার বা দরিদ্রকে শোষণ করার ফল, তার ওপর বেশি হারে কর আরোপ করাই যথাযথ। এই জটিলতা এড়িয়ে যাবার জন্যে দার্শনিক জন রল্‌স্ (John Rawls) একটা চমৎকার উপায় বার করেছেন, যাকে অজ্ঞানতার অবগুণ্ঠন (veil of ignorance) বলা হয়। ধরে নিন আপনি জন্মের আগের কোন ছায়াপৃথিবীতে আছেন, যাকে দর্শনের ভাষায় আদি অবস্থান (original position) বলা হয়, যেখানে আপনি পুরোপুরি সচেতন এবং চিন্তা করতে সক্ষম কিন্তু জন্মের পর আপনার পরিস্থিতি কি হবে তার সম্পর্কে কিছু জানেননা। ফলে আপনাকে খানিকটা নিরপেক্ষ হতেই হবে, কারণ জানেন তো না আপনার নির্বাচিত নীতিতে আপনার ভবিষ্যৎ সত্ত্বার ভালো হবে না মন্দ হবে। আপনি যদি ভাবেন, হ্যাঁ সুন্দর লোকেদের বেশি কর দেওয়া উচিত, ভাগ্যের খেলায় আপনি যদি সুন্দর হয়ে জন্মান, সেই কর আপনাকেও দিতে হবে এবং তার অন্যায্যতা নিয়ে গজগজ করার প্রবণতাও হবে, এ সবই ভেবে রাখা উচিত।

সাধারণত প্রগতিশীল কর ব্যবস্থার মাধ্যমে আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রধান যে দুই স্তম্ভ, সর্বজনীন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং সামাজিক নিরাপত্তা জাল (social safety net), এদের সংস্থানের সমর্থনে রল্‌সের যুক্তি ব্যবহার করা হয়। যুক্তিটা খানিকটা বীমার যুক্তির মত - ভবিষ্যতে আপনার কোন ক্ষতি হতেও পারে নাও হতে পারে, আপনি সেটা জানেননা। আজকে বসে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে না দিয়ে, আপনি এমন এক বীমার প্রকল্পে রাজি হতে পারেন, যাতে আপনার ভাগ্য খারাপ হলে আপনি সহায়তা পাবেন। কিন্তু এই সুবিধের জন্যে আপনাকে মূল্য দিতে হবে, এবং সেটা হল, আপনার ভাগ্য খারাপ না হলেও আপনাকে কিস্তির টাকা দিয়ে যেতে হবে। তখন মনে হতেই পারে, কেন দিচ্ছি, আর ঠিক তাই এই প্রকল্পে রাজি যদি হতে চান হতে হবে অজ্ঞানতার অবগুণ্ঠনের আড়ালে। এই অবগুণ্ঠন সরে

গেলে যা বাস্তবে হবে সৌভাগ্যবানেদের থেকে দুর্ভাগ্যবানেদের প্রতি অর্থের হস্তান্তর, আসলে তা যেন আপনারই সম্ভাব্য দুই জীবনপথের দুই সত্তার মধ্যে লেনদেন।

এবার ধরে নেওয়া যাক রল্‌সের এই জন্মের আগের কুয়াশাবৃত এক প্ল্যাটফর্মে জীবনের রেলগাড়ির অপেক্ষায় বসে আমরা সবাই এই আলোচনা করছি, এবং আমাদের হাতে ভুতের রাজার বর আছে, যে আমরা আলোচনা করে যে নীতিই বেছে নেব, সেটারই প্রবর্তন হবে। এবার লেখার গোড়ায় তোলা প্রশ্নগুচ্ছে ফিরে আসি। আপনার মনে হয় কি উত্তর বেছে নেওয়া হবে এই মিটিঙে? অনুমান করছি প্রত্যেকটা প্রশ্নরই উত্তর হল, না। ভেবে দেখা যাক কেন।

প্রথম যুক্তিটা হল অর্থনৈতিক দক্ষতার (economic efficiency) যুক্তি। বৈষয়িক প্রণোদনার ফলে মানুষ বেশি কাজ করার উৎসাহ পায়, এবং তাতে অর্থনৈতিক দক্ষতা বাড়ে, আর বৈষয়িক প্রণোদনার ধারণাটির মধ্যেই ফলাফলের অসাম্য নিহিত আছে। যে পরিশ্রম বেশি করবে, সে যদি সেই অনুপাতে ফল না লাভ করে, কেউই পরিশ্রম করতে চাইবেনা। তাতে সমাজের সার্বিক উৎপাদনশীলতা কমতে বাধ্য। আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল খেলা নিয়ে। সেই উদাহরণ অনুযায়ী যদি সব খেলায় বা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের সবার মধ্যে ফলাফল সমান করে দেওয়া হয়, তাহলে প্রতিযোগীদের উৎকর্ষের সাধনায় উদ্যম বা উদ্দীপনাও কমে যাবে। আর আর্থিক দক্ষতা কমে যাবার তুলনা টানলে, সব খেলা ড্র হলে, বা সব প্রতিযোগিতায় সবাই সমান ভালো করলে খেলা বা প্রতিযোগিতার মজা বা উত্তেজনাটাই হারিয়ে যাবে, দর্শকেরা উৎসাহ হারাবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, যশ বা প্রতিভার অসাম্যের প্রতিকার করা উচিত কিনা। এখানেও সমস্যা হল, তার ফলে সার্বিক দক্ষতা হ্রাস পাবে। বিখ্যাত লেখক লেখায় উৎসাহ পাবেননা, অঙ্কে ভাল ছাত্র পরিশ্রম করতে চাইবেনা। অর্থনীতির ক্ষেত্রে উদ্যোগ ও পরিশ্রম বাড়াবার জন্যে বৈষয়িক প্রণোদনার ভূমিকা নিয়ে প্রায় সবাই একমত । তবে, বৈষয়িক প্রণোদনার মাত্রা বা ধরন নিয়ে বিতর্ক আছে। কর্মের ফল নিয়ে কোন বৈষয়িক প্রণোদনা বা দায়বদ্ধতা না থাকলে সরকারি অফিসের “আসি যাই মাইনে পাই” ধরণের মনোবৃত্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে, তাতে উৎপাদনশীলতার ক্ষতি হবে। আবার অত্যধিক বৈষয়িক প্রণোদনা থাকলে ব্যক্তিগত লাভের সাথে সামাজিক ক্ষতির (যেমন অবাধ শিল্পায়নের ফলে পরিবেশ দূষণ) সম্ভাবনা তৈরি হবে, তা বেসরকারি ক্ষেত্রে অনেক সময়েই দেখা যায় । আগেই বলেছি, আয়কর নিয়েও একইভাবে ভাবা যেতে পারে - করের হার খুব বেশি হলে, মানুষ কাজ করার উদ্দীপনা হারাবে। কিন্তু করের হার খুব কম হলেও সমস্যা আছে। পরিকাঠামো থেকে আইনশৃঙ্খলা, এই সম্পূরক উপাদানগুলো ছাড়া ব্যক্তিগত উদ্দীপনা যাই হোকনা কেন সার্বিক উৎপাদনশীলতা বেশি হতে পারবেনা, আর এগুলোর যেহেতু খরচ আছে, তাই করের মাধ্যমে ন্যূনতম রাজস্বের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয় যুক্তিটা হল, মেধাতন্ত্রের যুক্তি। সমান কাজের জন্যে সমান আয়, এবং বেশি কাজ করলে সেই অনুপাতে বেশি আয় প্রাপ্য। এখন সবার দক্ষতা যদি সমান হয়, এবং ভাগ্য বা

পরিবেশের কোন প্রভাব না থাকে, তাহলে এই যুক্তির বিরোধিতা করা মুশকিল। কারণ, এখানে ফলের একমাত্র নিয়ন্ত্রক হল পরিশ্রম। পরিশ্রম হল ব্যয়ের মত, আয় থেকে ব্যয় বিয়োগ না করে আয় সমান করে দিলে, যে ব্যয় বেশি করেছে, তার সাথে অন্যায় হল। অন্যায় তখনই হবে যখন সমান পরিশ্রম করে সমান ফল উৎপাদন করা সত্ত্বেও দুজনের আয় যদি আলাদা হয়। দক্ষতা বা প্রতিভার ফারাক থাকলে, ব্যাপারটা আরেকটু তলিয়ে ভাবতে হবে। একই কাজ করতে দক্ষ একজনের কম সময় বা পরিশ্রম লাগবে, অথবা, কাজের যে পরিণাম, তার উৎকর্ষ বেশি হবে। এখানে আয় যদি ফলের ওপর ভিত্তি করে, তাহলে যে বেশি দক্ষ, সে অধিকতর লাভবান হবে, কারণ হয় তার একই কাজ করতে কম পরিশ্রম করতে হবে, নয়তো তার কাজের ফলের উৎকর্ষের জন্যে, একই সময় কাজ করে, তার আয় (বা যশ) বেশি হবে। এই ক্ষেত্রে মেধাতন্ত্রের যুক্তি হল দক্ষতা বা প্রতিভা তো কোন অন্যায্য উপায়ে পাওয়া সম্পদ না, যে তার ওপর কর বসাতে হবে? এই যুক্তিটা ন্যায়েরই (fairness) যুক্তি। প্রতিভা বা দক্ষতার কদর হওয়া উচিত। যে সত্যি ভালো খেলে, তারই তো জেতা উচিত। যিনি প্রতিভাবান লেখক, তাঁরই তো যশ প্রাপ্য। যে অঙ্কের ভালো ছাত্র, তারই তো অঙ্ক-পরীক্ষায় প্রথম হওয়া উচিত। এই ভাবনাকে আমরা উৎকর্ষের সম্মান বা মেধাতন্ত্র বলতে পারি। কেউ সৎপথে নিয়ম মেনে ভালো করলে, তা নিয়ে কার কি বলবার আছে? আমাদের তখনই ক্ষোভ হয় যখন কেউ অসৎপথে খেলায় জেতে, বা অন্যায় সুবিধা পায় বা তদ্বির-চাটুকারিতা-উৎকোচের সহায়তায় সফল হয়। নিয়ম মেনে খেলা হলে, হেরে গেলে মন খারাপ হতে পারে, কিন্তু সেই ফলাফলকে অন্যায্য ভেবে বিক্ষোভ হয়না।

তৃতীয় যুক্তিটা হল ব্যক্তিস্বাধীনতার যুক্তি। স্বাধীন নাগরিক হিসেবে দেশ বা সমাজ বা সরকার আমাদের মালিক নয়, তাই আমাদের অধিকার খর্ব করে এমন যে কোন নীতি চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে এই যুক্তিটা প্রয়োগ করা যেতে পারে। কর ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি হল, নিরাপত্তা, আইন - শৃঙ্খলা বজায় রাখা, এবং পরিকাঠামো তৈরি করা ও বজায় রাখার খরচ আছে। অথচ এগুলো ছাড়া শুধু ব্যাক্তিগত উদ্যোগে অর্থনৈতিক সম্পদ সৃষ্টি হতে পারেনা । তাই এই খরচের ভাগ সবাইকে সাধ্যমত দিতে হবে, এবং যার সাধ্য বেশি, সে বেশি কর দেবে। কিন্তু অতি-উদারবাদীদের (libertarian) মতে সরকারের ন্যূনতম এইসব দায়িত্ব পালনে যে খরচ, তা মেটানোর প্রয়োজন বাদ দিলে নাগরিকদের আয় বা সম্পদের পুনর্বণ্টনের আর কোন নৈতিক অধিকার সরকারের নেই, কারণ তা ব্যক্তিস্বাধীনতায় অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ। [৩] আয় বা সম্পদের মালিকানা ব্যক্তির, সেখানে সে কর দিতে পারে (এবং করের হার বেশি মনে হলে সে অন্য রাজ্যে বা দেশে চলে যেতে পারে) কিন্তু এর বাইরে তার সম্পদ বা আয়ে দখলদারি করা জোরজবরদস্তির (coercion) সমান, এবং তার অধিকার সরকারের বা অন্য কারোর নেই। ন্যায্য কর দেবার পর আমার যদি বেশি আয় বা সম্পদ থাকে, সেটা আমার ব্যাপার, তাতে আর কারোর ঈর্ষা হতেই পারে, কিন্তু সেটা কেড়ে নেবার অধিকার নেই। আর, মানুষের যে সম্পদ বস্তুগত বা আর্থিক নয় (যেমন, মাতা-পিতার শিক্ষা বা রূপ বা স্বাস্থ্য), প্রাকৃতিক বা

জন্মগত কারণে পাওয়া, সেখানে সমতার কাঁচি চালিয়ে সব সমান করে দেবার ইচ্ছেটাই তো অদ্ভুত। আমাদের এই আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার এই যুক্তিটাকে আমরা খানিকটা এড়াতে পারি। কারণ, এখানে ধরেই নেওয়া হচ্ছে, অজ্ঞানতার অবগুণ্ঠনের আড়ালে বসে স্বেচ্ছায় আমরা এই নীতিগুলোর সম্ভাব্য প্রবর্তন আলোচনা করছি। অর্থাৎ, এই আলোচনার ফলে আমরা যদি প্রশাসন চালানর জন্যে যে ন্যূনতম খরচের প্রয়োজন, তার ভাগ দেবার প্রয়োজনের থেকে বাড়তি কোন আয় বা সম্পদের পুনর্বণ্টনের নীতি স্বেচ্ছায় অবলম্বন করতে রাজি হই (যেমন ধরা যাক ঠিক হল যে, আমাদের মধ্যে কেউ দুর্ঘটনার শিকার হলে, সে সরকারি সাহায্য পাবে), তাহলে তো আর জোরজবরদস্তির অভিযোগটা খাটেনা। তাহলেও আয় বা অর্থসম্পদ বাদ দিয়ে অন্য যে নানা সম্পদ এবং সাফল্যের সূচকের উদাহরণ আছে সেগুলোতে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে একটা অস্বস্তি থেকে যায়। প্রশ্ন হল, কেন? এক হতে পারে এগুলো আয় বা সম্পদের মত নৈর্ব্যক্তিক ভাবে মাপা এবং তার ওপর নীতি নির্ধারণ করা বাস্তবসম্মত নয়। আরেকটা যুক্তি হল, মানুষের বাহ্যিক সম্পদ এবং তার নিজস্ব শ্রমশক্তি, গুণাবলী এবং মানবসম্পদের মধ্যে একটা বড় তফাৎ আছে। প্রথমটির ওপর মানুষের কোন স্বাভাবিক (natural) অধিকার নেই, যদিও আইনি অধিকার থাকতে পারে, কিন্তু অন্যগুলির ওপর তার অবিচ্ছেদ্য (inalienable) অধিকার। তার লঙ্ঘন করা দাসপ্রথার সাথে তুলনীয়। [৪]

এখানে অসাম্যের উদাহরণগুলো ইচ্ছে করেই এমন ভাবে নির্বাচন করেছি, যে সেগুলো দূর করার পক্ষে যুক্তি খাড়া করা মুশকিল, সে নীতির দিক থেকেই হোক বা সম্ভবপরতার দিক থেকে। বরং, অসাম্য মেনে নেবার স্বপক্ষে (বা পুনর্বণ্টনের বিরুদ্ধে) আমরা গোটা কয়েক যুক্তি পেশ করেছি, সেগুলো হল আর্থিক দক্ষতা, মেধাতন্ত্র, এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার সম্মান। এবার চলি বিপ্রতীপে।

২। অসহ অসাম্য

আবার আরেক গুচ্ছ প্রশ্ন, তবে আমার নয়, কবি সুকান্তর :

বলতে পার বড়মানুষ মোটর কেন চড়বে?
গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে?
বড়মানুষ ভোজের পাতে ফেলে লুচিমিষ্টি-
গরীবরা পায় খোলামকুচি, একই অনাসৃষ্টি?
বলতে পারো ধনীর বাড়ি তৈরি যারা করছে
কুঁড়েঘরেই তারা কেন মাছির মত মরছে?
ধনীর মেয়ের দামী পুতুল হরেক রকম খেলনা,
গরীব মেয়ে পায় না আদর, সবার কাছে ফেলনা।
বলতে পারো ধনীর মুখে যারা যোগায় খাদ্য
ধনীর পায়ের তলায় তারা থাকতে কেন বাধ্য?

সুকান্ত আমাদের কাছে অসাম্যের এই বিভিন্ন উদাহরণগুলো সহনীয় কিনা জিজ্ঞাসা করছেননা। ধরেই নেওয়া হচ্ছে তার উত্তর হল না। উনি যে আঙ্গিকে প্রশ্নগুলো করেছেন, তার উদ্দেশ্য এটাই দেখান, যে এর কোন গ্রহণযোগ্য উত্তর নেই। তাই যে ব্যবস্থা এই অসাম্য সৃষ্টি করে, প্রশ্নগুলো তার অন্যায্যতার প্রতি তোলা অভিযোগের আঙ্গুল। যে অসাম্যের ছবি এই ছড়াটিতে প্রায় সত্তর বছর আগে কবি এঁকেছেন, তার শৈলী এবং প্রাসঙ্গিকতা এমনই যে আজও তা আমাদের ক্ষুব্ধ করে, আমাদের ন্যায়বোধে কশাঘাত করে, এবং জাগিয়ে তোলে এর প্রতিকার করার ইচ্ছে।

একটু তলিয়ে ভেবে দেখা যাক কেন এইধরণের অসাম্যের আমরা বিরোধী।

প্রথমত, প্রত্যেকটা উদাহরণে ধনী ও গরীবের মধ্যে বিত্ত ছাড়া আর কিছুর ফারাক নেই। যেমন, ধরে নেওয়া যায়, এই বিত্ত অর্জনের জন্যে কোন প্রতিভা বা পরিশ্রম বা সঞ্চয়ী মনোভাবের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। ধন এখানে হয় সম্পূর্ণ ভাগ্যনির্ধারিত আর তা না হলে অন্যায় উপায়ে, শোষণের মাধ্যমে পুঞ্জীভুত এক বিশেষাধিকার (privilege) যা কোন অর্থেই প্রাপ্য বা অর্জিত নয়। তুলনায় একজন দরিদ্র মানুষকে বেঁচে থাকার জন্যে অসহনীয় পরিশ্রম করতে হয় । তার আয়টা ন্যায্য পথে অর্জিত, কিন্তু পরিশ্রম এবং ফলের মধ্যে সমীকরণটা নেহাতই অন্যায্য । কবি নিজেই এই কবিতার শেষ দুই পঙক্তিতে তাঁর করা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন :

‘হিং-টিং-ছট’ প্রশ্ন এসব, মাথার মধ্যে কামড়ায়,
বড়লোকের ঢাক তৈরি গরীব লোকের চামড়ায় ।।

অর্থাৎ, ধনীর ধন গরীবের রক্ত শুষেই তৈরি হয় । তার আগের পঙক্তিগুলোতে ছিল ধনী ও গরীবের জীবনযাত্রার বিসদৃশ বৈষম্যের কথা, কিন্তু এই বৈষম্য কি ভাবে তৈরি হচ্ছে সেই প্রশ্নের উত্তর ছিলনা। কবির উত্তর হল, একটি আরেকটির প্রত্যক্ষ কারণ। আগের অংশে আয় বা সম্পদের পুনর্বণ্টনের নৈতিক অধিকার নিয়ে উদারপন্থীদের আপত্তির কথা আলোচনা করেছি। কিন্তু সেখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে এই বিত্ত সৎপথে আইন মেনে উৎপাদিত হয়েছে। আর এখানে ছবিটা একদম উল্টো। ধনীর যে বিত্ত তাতে তার কোন বৈধ অধিকার নেই, কারণ তা অন্যায় উপায়ে অর্জিত। চোর বা ডাকাত অসৎপথে পাওয়া সম্পদের অধিকার জাহির করলে তা যেমন হাস্যকর হবে, এখানেও তাই। এর আগে খেলার যে উদাহরণ ব্যাবহার করেছিলাম, তার সূত্র টেনে বলা যায়, এখানে খেলাটা ময়দানের ভাষায় পুরো গট-আপ। এখানে পুনর্বণ্টনই একমাত্র নৈতিক পথ।

সুকান্ত যে ধনীদের প্রতি তাঁর তীব্র শ্লেষ নিক্ষেপ করেছেন তার পটভূমি মনে রাখা দরকার। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি লেখা এই ছড়ার ঠিক আগে তেতাল্লিশের মন্বন্তরে বাংলায় বহুলক্ষ মানুষ অনাহারে মারা যান এবং তা রোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ঔপনিবেশিক ও আঞ্চলিক সরকারের বড় দায়িত্ব ছিল, কিন্ত তা ছাড়াও, স্বদেশী কালোবাজারি ব্যবসায়ী, ধনী কৃষক, এবং জমিদারদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকাও ছিল। এই জায়গা থেকে দেখলে বোঝা যায় কেন সুকান্ত লিখেছেন, "বড়লোকের ঢাক তৈরি গরীব লোকের চামড়ায়"।

ইতিহাসের বিশেষ কোন পর্যায়ে এটাই রীতি হতেই পারে। দাস ব্যবস্থার কথা নয় বাদই দিলাম, যার অন্যায্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠেনা। উনবিংশ শতাব্দীর অ্যামেরিকায়, রবার ব্যারন কথাটা ব্যবহার হত সেই সব ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি সম্পর্কে যাঁরা অন্যায় উপায়ে ধন সঞ্চয় করতেন । তার মধ্যে সরকারকে উৎকোচ দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার, শ্রমিকদের শোষণ করা, অন্যায় উপায়ে প্রতিযোগিতার পথ বন্ধ করা, শেয়ারের দাম ইচ্ছে করে বাড়িয়ে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সেই কোম্পানি ইচ্ছে করে লাটে তুলে দেওয়া ছিল (শেষোক্ত প্রসঙ্গে পরশুরামের "শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী প্রাইভেট লিমিটেড" গল্পটি স্মরণীয়)। মার্ক্সের আদিম ধনসঞ্চয়ের (primitive accumulation) তত্ত্ব এখানে মনে পড়ে যেতে বাধ্য।

সমসাময়িক ভারতের অর্থনীতিতে এই ধরণের ডাকাত ধনপতি নেই বললে নেহাতই বাস্তবকে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু সব সমাজে সব ধনী যে সব সময়ে অসৎপথেই তাঁদের সব টাকা রোজগার করেন, তাও তো বলা যায়না। অনেক সময়েই তাঁরা নতুন কিছু উদ্ভাবন করে কিম্বা কোন পণ্য বা পরিষেবা উৎপাদন ও যোগানের মাধ্যমে সৎপথেই লাভ অর্জন করেন। শুধু তাই নয়, এঁদের বিনিয়োগের ফলে চাকরির চাহিদা বাড়ে, এবং মজুরি ও কর্মনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র কমে। এঁদের আয়ের থেকে যে কর সংগৃহীত হয় তার ফলে সরকারি পরিকাঠামো এবং পরিষেবার ওপর খরচ করার সামর্থ্য বাড়ে। সেই জন্যেই দেশে-বিদেশে বাম থেকে ডান সব সরকারই বিনিয়োগ আকর্ষণের প্রচেষ্টায় সদাব্যস্ত। অর্থাৎ, ধনতন্ত্রে সব খেলা তো আর শূন্য অঙ্কের খেলা নয়, কিছু কিছু খেলা ধনাত্মক অঙ্কেরও হয়। লাভ মানেই শোষণ এই সমীকরণ সবক্ষেত্রে নিশ্চয়ই খাটেনা।

আর একটা কথা আছে। যেখানে অসাম্যের সূত্র অন্যায্য উপায়ে আহৃত সম্পদ, সেখানে আমাদের মূল সমস্যা অসাম্য নিয়ে, না যে অন্যায় ব্যবস্থার ফলে সেটা হয় সেটা নিয়ে? এই ক্ষেত্রে অসাম্য হল উপসর্গমাত্র, অসমান খেলার মাঠ এবং অন্যায় খেলার নিয়ম হল মূল সমস্যা। সেই ব্যবস্থার সংস্কার না করে ধনের পুনর্বণ্টন করলেই যে সমস্যা মেটেনা, নতুন ডাকাত ধনপতিদের জন্ম হয় মাত্র, এর উদাহারণও ইতিহাসে প্রচুর।

দ্বিতীয়ত, এমন যদি হয় যে ধনীরা তাদের বিত্ত পরিশ্রম ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে সৎপথেই অর্জন করেছেন, তাহলে সরকারের ন্যূনতম ভূমিকা পালন করার যে খরচ, তার অংশ দেওয়া ছাড়া কি আয় বা সম্পদের পুনর্বণ্টনের স্বপক্ষে কোন যুক্তি আছে? আছে, কারণ আর সব কিছু এক রেখে আর্থিক দিক থেকে কেউ যদি অভাবী হয়, সে তার মেধার বিকাশের সুযোগ কম পাবে, তার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও দক্ষতার সাথে ফলাফলের সমীকরণে একটা ঘাটতি পড়ে যাবে। এখানে মেধাতন্ত্রের যুক্তিটা খাটেনা । সবচেয়ে ভালো দল বা খেলোয়াড় জিতুক খুব ভালো কথা, কিন্তু খেলার মাঠ তো সমান নয়। মতি নন্দীর কোনি পাঠকের অকুণ্ঠ সমর্থন পায় কারণ তার সাথে তার স্বচ্ছল প্রতিদ্বন্দীদের সুযোগ এবং সম্পদের বিশাল ফারাক। আমরা ক্ষিদ্দার সাথে মনে মনে বলে উঠি "ফাইট, কোনি, ফাইট" কারণ এমন নয় যে কোনির প্রতিভা সবার থেকে অনেকটা বেশি। কারণ হল, তাকে অন্যান্য প্রতিযোগীদের তুলনায় অনেক বেশি বাধা অতিক্রম করতে হচ্ছে। সেই বাধা দারিদ্রের, এবং তজ্জনিত সুযোগের অভাবের। এই ক্ষেত্রে খেলাটা হয়তো গট-আপ নয়, কিন্তু প্রতিযোগীদের মধ্যে ফারাকটা শুধু দক্ষতা আর পরিশ্রমের নয়, সুযোগেরও। অর্থাৎ অন্যায় না হলেও এটা অসমান প্রতিযোগিতা।   আরেকটা উদাহরণ নেওয়া যাক - শিশু শ্রম। শিশু শ্রমিক হল সুযোগের অসাম্যের একটা চরম নিদর্শন । অভাবের কারণে যার পড়াশুনো হলনা, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় প্রথম ধাপেই সে অনেকটা পিছিয়ে পড়ল । তার মানবসম্পদ বিকশিত না হয়ে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। তাতে তারও ক্ষতি, সমাজেরও ক্ষতি অথচ এই ক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ কোন দায়িত্ব নেই । দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়াটা এই দিক থেকে দেখলে নিতান্তই জীবনযুদ্ধের প্রাঙ্গনে ঢাল-তরোয়াল-বর্ম-রথ ছাড়া সশস্ত্র সেনানীর মুখোমুখি হবার মত।

আমাদের মূল বিষয়ে যদি ফিরে আসি, এই প্রতিবন্ধক আর্থিক হবার জন্যে আমরা যে পদ্ধতির (অজ্ঞানতার অবগুণ্ঠন) মাধ্যমে পুনর্বণ্টনের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিগুলোর বিচার করছি, এই ক্ষেত্রে পক্ষের যুক্তিটা বেশ জোরদার । সমান দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও, এবং সমান পরিশ্রম করেও কেউ যদি আর্থিক কারণে সমান সুযোগ না পায়, আর তার জন্যে সে যদি ফলাফলের দৌড়ে পিছিয়ে পড়ে, তাহলে সেটাকে আর যাই হোক মেধাতন্ত্র বলা যায়না। উদ্যম ও প্রচেষ্টার প্রণোদক হিসেবে এবং মেধাতন্ত্রের যুক্তিতে ফলাফলের অসাম্য যদি আমরা মেনেও নিই, অন্তত আর্থিক সুযোগের অসাম্য দূর করার জন্যে নীতির বিপক্ষে নৈতিক দিক থেকে খুব একটা যুক্তি নেই। আপনার মনে হতেই পারে, ঠিক আছে, পৃথিবীতে অনেক অন্যায় আছে, কিন্তু আমার হাতে তো নাই ভুবনের ভার। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আপনি অজ্ঞানতার অবগুণ্ঠনের আড়ালে এই নীতির আলোচনা করছেন, ভাগ্যচক্রে সুযোগের অভাবের শিকার আপনিও হতে পারেন। খেয়াল করে দেখুন, এখানে যারা সুযোগের দিক থেকে পিছিয়ে আছে তাদের সমান সুযোগ দেবার কথা হচ্ছে, যাতে তারা সমতল ক্রীড়াঙ্গনে (level playing field) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে । সেটা করতে গেলে নিশ্চয়ই অর্থের প্রয়োজন, এবং সেই অর্থ নিশ্চয়ই বিত্তবান শ্রেণীর কাছ থেকেই আনুপাতিক হারে বেশি আসবে কারণ তাদের সামর্থ্য বেশি। এখানে লক্ষ করার বিষয় হল, এই যুক্তি অনুসারে সমস্যাটা কিন্তু দারিদ্রের, অসাম্যের

নয়। যদিও বাস্তবে দারিদ্র ও অসাম্য অনেক সময়ে একইসাথে দেখা যায়, যুক্তির দিক থেকে দেখলে তাদের মধ্যে কোন সরল সম্পর্ক নেই। দরিদ্র এমন সমাজের কথা ভাবাই যায় যেখানে অসাম্য (অর্থাৎ ধনী-দরিদ্রের ফারাক) কম, আবার অসম সমাজের কথা ভাবা যায়, যেখানে দারিদ্র কম। দারিদ্রের কারণে সুযোগের যে অসাম্য, এখানে সেটা দূর করাই উদ্দেশ্য, ফলাফলের অসাম্যের বিরুদ্ধে কিন্তু কোন নীতি নেওয়া হচ্ছেনা।

এই প্রসঙ্গে সামাজিক বৈষম্যের কথা উল্লেখ না করলে আলোচনা নেহাতই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সুকান্ত তাঁর ছড়াটিতে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের ওপরেই মনোনিয়োগ করেছেন, যা প্রথাগত বামপন্থী চিন্তাধারাতেও সচরাচর করা হয়ে থাকে। আর্থিক অবস্থা এক রেখেও, সামাজিক বিধির কারণে বর্ণ-জাতি-লিঙ্গ ভেদে সবাই সমান সুযোগ পায়না। প্রতিদিন নানা ভাবে যদি কেউ তাঁর সামাজিক অবস্থান বা লিঙ্গের কারণে নানা বাধার মুখোমুখি হন, মেধাতন্ত্রের স্বপক্ষে যুক্তিটা দুর্বল হয়ে পড়ে। আগের অংশে আলোচনা করেছি যে মেধাতন্ত্রের একটা প্রাথমিক শর্ত হল, সমান কাজের জন্যে সমান আয়। সামাজিক বৈষম্যের ফলে এই শর্ত লঙ্ঘন হয়। শুধু তাই না, এই বৈষম্যের প্রত্যাশা প্রতিভার বিকাশের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। মহাভারতের একলব্যের কথা আজও আমাদের পীড়া দেয় । আর "মেয়েদের কাজ সংসার করা" বা "মেয়েরা বিজ্ঞানে কাঁচা" এই ধরণের বাক্যে যুগে যুগে অজস্র প্রতিভা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছে। এই ধরণের বৈষম্যের প্রতিকারের নানা নীতির মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আইনি ব্যবস্থা, সামাজিক-অবস্থান ভিত্তিক বিশেষ আর্থিক সাহায্য (যেমন, মেয়েদের জন্যে বিশেষ বৃত্তি), এবং সংরক্ষণ পড়ে, যদিও এদের নির্দিষ্ট রূপ এবং আপেক্ষিক গুণাগুণ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে, যা এই আলোচনার পরিধির বাইরে। খেয়াল করে দেখুন যে এই ক্ষেত্রেও রল্সের যুক্তিটা প্রযোজ্য - আপনার সামাজিক পরিচিতি কি হবে আপনি যদি না জানেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি বৈষম্য-বিরোধী নীতি সমর্থন করবেন।

তৃতীয়ত, এবার আসি আরেক স্তরের জটিলতায়। ধরা যাক ধনীদের সম্পদ অন্যায় উপায়ে আহৃত নয় এবং যে ধরণের সুযোগের অসাম্য কথা এক্ষুনি আলোচনা করলাম, তা প্রযোজ্য নয়। ধরা যাক একই পরিবারের মধ্যে দুই ভাই বা দুই বোনের কথা। ধরে নেওয়া যাক ছোটবেলা থেকেই তাদের মধ্যে বাহ্যিক সুযোগের কোন ফারাক নেই। তাহলেও অনেক সময়ই দেখা যাক তারা জীবনে সমানভাবে সফল হয়না (সে সাফল্যের যে মানদণ্ডই আমরা নিই, অর্থ বা যশ বা সুখ)। এর জন্যে হয় দক্ষতা ও ব্যক্তিগত গুণাবলীর, বা পরিশ্রম ও উদ্যমের ফারাক, বা নেহাতই ভাগ্যের ভূমিকা থাকে। এবার প্রশ্ন হল, এই ক্ষেত্রে যে তুলনায় অসফল, তার প্রয়োজনে তাকে সাহায্য করার জন্যে তার পরিবারের বাড়তি কিছু করণীয়? পরিবারের ক্ষেত্রে উত্তরটা সচরাচর হ্যাঁ, কারণ স্নেহ-মমতার স্বাভাবিক ধর্মেই সেখানে প্রয়োজন এবং সাহায্যের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে। এবার ধরে নেওয়া যাক যে সমাজেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধনী এবং গরীবের অসাম্যের সূত্র সুযোগের অসাম্য নয়, যোগ্যতা র ফারাকের, জীবনের নানা পদক্ষেপে নেওয়া কিছু ভুল সিদ্ধান্তের ফলের (যেমন, কুসঙ্গে মিশে পড়াশুনো

ছেড়ে দেওয়া, বা নেশার বশ হওয়া), বা নেহাতই দুর্ভাগ্যের (যেমন, দুর্ঘটনা বা মন্দার কারণে চাকরি হারানো) প্রতিফলন। এখানে কি যে পিছিয়ে পড়েছে তার প্রতি সমাজের কোন দায়িত্ব আছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার? রল্‌সের প্রস্তাবিত আঙ্গিকে ভাবলে এক্ষেত্রে যে বঞ্চিত তার জীবনযাত্রার মান যেন ন্যূনতম একটা স্তরের তলায় না চলে যায়, তার ব্যবস্থা করা উচিত। তার কারণ হল এই প্রস্তাবিত নীতি একটা বীমার প্রকল্পের মত, যা একটু আগে আলোচনা করেছি। বীমার প্রকল্পের ধর্মই হল, শুরুতে সবাই একই পরিস্থিতিতে থাকে, এবং সমান হারে কিস্তি দেয়, কিন্তু তারপর যার প্রয়োজন (অসুখ বা দুর্ঘটনার কারণে) সে সেই অনুযায়ী সাহায্যলাভ করে। লক্ষ্য করে দেখুন যে এই যুক্তির সাথে সুযোগের সাম্য তৈরি করার কোন সম্পর্ক নেই । আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের স্বপক্ষে এই "সামাজিক বীমার" যুক্তিটি অনেক সময় ব্যবহার করা হয়।

প্রবন্ধের প্রথম অংশের তুলনায় এখানে অসাম্যের উদাহরণ গুলো এমন, যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পুনর্বণ্টনের সমর্থনে যুক্তি আছে। যদি অসাম্যের উৎস হয় অন্যায় শোষণ তাহলে পুনর্বণ্টনের পক্ষে যুক্তি হল ন্যায়ের যুক্তি। ফলাফলের অসাম্যের উৎস যদি হয় আর্থিক সুযোগের অসাম্য, বা প্রত্যক্ষ সামাজিক বৈষম্য তাহলে পুনর্বণ্টনের স্বপক্ষে যুক্তি হল, সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা করার। মনে রাখা ভালো, আগের অংশে আমরা এমন কিছু উদাহরণ দেখেছি, যাতে সুযোগের অসাম্য থাকলেও (যেমন মা-বাবার শিক্ষা বা ব্যক্তিগত গুণাবলী) তার প্রতিকারের জন্যে কোন নির্দিষ্ট নীতির কথা ভাবা মুশকিল। আর অসাম্যের উৎস যদি সুযোগ-সম্পর্কিত নাও হয় (যেমন, ভুল সিদ্ধান্ত, দুর্ভাগ্য) তাহলেও সবার জীবনযাত্রার মান যেন ন্যূনতম একটা স্তরের নিচে না চলে যায়, পুনর্বণ্টনের স্বপক্ষে এই ধরণের সামাজিক বীমার একটা যুক্তি আছে।

৩। অনিবার্য অসাম্য?

প্রথম দুই অংশে আমরা অসাম্যের পক্ষের এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলো আলোচনা করলাম। কিন্তু এগুলো যোগ-বিয়োগ করে কি সিদ্ধান্তে আসব?

মূল লড়াইটার একদিকে সুযোগের অসাম্য এবং ভাগ্য-তাড়িত চরম অনটনের প্রতিকার আর অন্যদিকে অর্থনৈতিক দক্ষতাহ্রাসের সম্ভাবনা। আমরা যেহেতু রল্‌সের পদ্ধতি ব্যবহার করছি, অসাম্যের পক্ষে অন্য যে যুক্তি, মেধাতন্ত্র এবং ব্যক্তিস্বাধীনতায় অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ, সেখানে অতটা জোর দিচ্ছিনা। কারণ, যে নীতি অবলম্বন করা হবে, তা আমরা আমাদের ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে সরে গিয়ে একটা নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে করছি। তাই মেধাতন্ত্রের কথা মাথায় রেখেই আমরা সুযোগের অসাম্যের প্রতিকার করছি। আর, যেহেতু এই নীতি নির্ধারিত হচ্ছে স্বেচ্ছায়, আমাদের এই নিরপেক্ষ সত্ত্বার দিক থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হচ্ছেনা। সেই রকম, অসাম্যের বিপক্ষে যে যুক্তি এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে তাতে অন্যায় শোষণের

সম্ভাবনা থাকবেনা, কারণ আমরা স্বেচ্ছায় নিরপেক্ষ ভাবে এরকম ব্যবস্থার কখনই সমর্থন করবনা, কারণ অজ্ঞানতার কুয়াশা সরে বাস্তবের রোদ উঠলে আমরা নিজেরাই শোষিতের দলে পড়ে যেতে পারি।

সুযোগের অসাম্য এবং ভাগ্য-তাড়িত চরম অনটনের প্রতিকার আর অর্থনৈতিক দক্ষতাহ্রাসের যে দ্বন্দ্ব তা আমরা কিভাবে নিষ্পত্তি করব? উত্তরটা কি মাঝামাঝি রফা? অর্থাৎ, বেশি অসাম্য ভালোনা, আবার বেশি সাম্যও ভালোনা - যাকে বাংলাভাষায় “মিউচুয়াল” করে নেওয়া বলা হয়। তা করব্যবস্থার মাধ্যমে না হয় আয়ের অসাম্য খানিক কমানো গেল, অতি-উদারবাদীরা ন্যূনতম প্রশাসনের খরচ মেটাতে যতটাতে খুশি হবেন, সুযোগের সাম্য এবং সামাজিক সুরক্ষাজালের কথা ভেবে তার থেকে নয় বেশিই পুনর্বণ্টন করা হবে ঠিক হল। কিন্তু প্রশ্নটা হল প্রয়োজনের কোন মাপকাঠি ব্যবহার করে পুনর্বণ্টনের প্রস্তাব রূপায়িত হবে ?

রল্‌সের মত হল, দুজন মানুষের মধ্যে সুযোগের তুলনা করার প্রধান মাপকাঠি হল, কিছু সর্বপ্রয়োজনীয় জিনিসের ওপর তাদের অধিকার। আমাদের নানা জনের নানারকমের পছন্দ এবং বয়সের সাথে সাথে সেগুলো পাল্টাতেও থাকে। হয়ত আমরা কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ সুখ চাইব। তাই আদি অবস্থানের কুয়াশাময় প্লাটফর্মে বসে জীবনে কি চাই, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মুশকিল। ভুতের রাজা যদি বর দিতে চান, তাহলে খুব নির্দিষ্ট কিছু চাইলে মুশকিল, পরে আক্ষেপ হতে পারে। রল্‌স্ এখানেও একটা ভালো বুদ্ধি বার করেছেন, সেটা হল প্রাথমিক পণ্যের (primary goods) ধারণা । আমরা জীবনে কি করব না জানলেও, প্রতি পদে যা চাইতে পারি তা পাবার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা যা যা থাকলে হবে, তাই হল প্রাথমিক পণ্য। অজ্ঞানতার অবগুণ্ঠনের আড়ালে বসে আমরা সবাই তাই একমত হতে পারি, প্রাথমিক পণ্য আমাদের কতটা আয়ত্তে সেটাই আমাদের জীবনে সুখ এবং সাফল্যের (তার নির্দিষ্ট রূপ যাই হোকনা কেন) সব চেয়ে বড় নির্ধারক। এর মধ্যে যেমন মৌলিক কিছু অধিকার আছে (যেমন রাজনৈতিক, ধর্মপালন ও মতপ্রকাশের অধিকার), সেরকম সুযোগের দরজা (যেমন, বিভিন্ন পেশায় যোগ দেবার পথ) খোলা থাকার কথা বলা আছে, আয় ও ধনের অধিকারও আছে, এবং আত্মসম্মানের সাথে সমাজে বাস করার অধিকারও আছে। [৫] ভুতের রাজার বর সত্যি যারা পেয়েছিল, সেই গুপি আর বাঘা কি চেয়েছিল এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করতেই হয়। প্রথম বরে তারা ইচ্ছেমত পছন্দসই খাবার পাবার, দ্বিতীয় বরে যেখানে খুশি নিমেষে যাবার, এবং তৃতীয় বরে, এমন সঙ্গীতপ্রতিভা আয়ত্ত করার বর চেয়েছিল, যাতে তাদের গান শুনে লোকে সম্মোহিত হয়ে যাবে। এই তিনটেই প্রাথমিক পণ্যের ভালো উদাহরণ, বিশেষত তিন নম্বর বরটির মধ্যে পছন্দসই পেশা এবং সামাজিক সম্মান দুটোই আছে।

লক্ষ্য করে দেখুন, প্রাথমিক পণ্যের ধারণার মধ্যেই যে চরম দারিদ্র বা সামাজিক বৈষম্য বা মৌলিক কিছু অধিকারের অভাব যে ন্যায্য সমাজব্যবস্থার ধারণার সাথে খাপ খায়না তা মেনে নেওয়া হচ্ছে। আমরা আগেই দেখেছি নৈতিক আপত্তি না থাকলেও সাহস করে জাত বা লিঙ্গবৈষম্যের প্রস্তাবে কেউই একমত হবেন না - অজ্ঞানতার অবগুণ্ঠন সরে গেলে যদি দেখতে পাওয়া যায় আপনারই কপালে জুটেছে বঞ্চিত গোষ্ঠীর সদস্যপদ! তাই এই যুক্তি ব্যবহার করে আইনের চোখে সবার সমান অধিকারের প্রশ্নে একমত হওয়া সোজা।

প্রাথমিক পণ্যের মধ্যে যেগুলো বস্তুগত (আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) সেগুলো একটা ন্যূনতম মাত্রায় যাতে সবার আয়ত্ত থাকে, তার জন্যে যে খরচ তা মেটাতে করব্যবস্থার মাধ্যমে আয় ও সম্পদের আংশিক পুনর্বণ্টন প্রয়োজন। এখন এই পণ্যগুলো যোগান দেবার দায়িত্ব সরকার প্রতক্ষ্যভাবে নেবে (সরকারি স্কুল, হাসপাতাল) না তার জন্যে অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করে সেগুলো যোগাড় করে নেবার দায়িত্ব ব্যক্তি বা পরিবারের হাতে ছেড়ে দেবে, সেই প্রসঙ্গে এখানে ঢুকছিনা।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই পুনর্বণ্টনের জন্যে যে সুযোগের অসাম্যের অথবা চরম অনটনের আংশিক প্রতিকার হবে তার পাশাপাশি অর্থনৈতিক দক্ষতা খানিকটা হ্রাস পাবে (করের হার বেশি হলে ব্যক্তিগত উদ্যম খানিকটা খর্ব হবেই)। এই লাভক্ষতির হিসেব কি করে করা হবে? এর কোন নৈর্বক্তিক উত্তর হয়না, তা আমাদের নৈতিক বিচারের ওপর নির্ভর করবে। রল্‌সের নিজস্ব মত হল, আদর্শ নীতি হল তাই, যা সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণের কথা ভেবে নেওয়া। এই প্রসঙ্গে গান্ধীর বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে যেতে বাধ্য - "যে কোন পদক্ষেপ নেবার আগে তোমার পরিচিত সবচেয়ে দরিদ্র এবং দুর্বল মানুষের মুখটা ভাব এবং ভেবে দেখ এতে তার কোন উপকার হবে কিনা।" [৬] এই বিষয়ে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত থাকতে পারে। কেউ মনে করতে পারেন, যে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা নয়, গড় নাগরিকের কল্যাণের ওপর জোর দেওয়া উচিত। বা কেউ এমনও মনে করতেই পারেন, সরকারের ন্যূনতম দায়িত্ব পালনে যে খরচ তার বাইরে কোন রকম পুনর্বণ্টনের প্রয়োজন নেই। যিনি ঝুঁকির পরোয়া করেননা, তিনি জানেন যে তাঁর ভাগ্য ভালোও হতে পারে, আবার মন্দও হতে পারে। কিন্তু এই ঝুঁকি নিতে তিনি প্রস্তুত, বিশেষত পুনর্বণ্টনের ফলে যখন অর্থনৈতিক দক্ষতার ক্ষতি হতে পারে।

এখানে লক্ষণীয় এই যে, রল্‌সের নীতিকে আপাতদৃষ্টিতে খুবই সমতাপন্থী মনে হলেও, এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আয়ের ও সম্পদের খানিকটা অসাম্য মেনে নেওয়া হচ্ছে। তার কারণ, আয় বা সম্পদ সর্বদা সম্পূর্ণ সমান হবে এরকম নীতি অবলম্বন করলে, অর্থনৈতিক দক্ষতাহ্রাসের সম্ভাবনা এতটাই হবে, যে তাতে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষেরও কল্যাণ হবেনা। উদাহরণ হিসেবে ভাবা যেতে পারে বৈষয়িক প্রণোদনের অভাবে উদ্যম যদি তলানিতে গিয়ে ঠেকে,

তাহলে দেশের গড় আয় এতটা কমে যাবে, যে কর ব্যবস্থার মাধ্যমে পুনর্বণ্টন করে সবচেয়ে দরিদ্রদের সাহায্য করার সামর্থ্যও কমে যাবে। তার মানে, খানিকটা অসাম্য অনিবার্য।

এখন অবধি অসাম্যের পক্ষে এবং বিপক্ষে যত যুক্তিই আমরা দেখলাম, তাতে সমস্যাটা আপাতদৃষ্টিতে বঞ্চনা বা দারিদ্রের, অসাম্যের নয়। রল্‌সের প্রস্তাবিত নৈতিক কাঠামোরও মূল উদ্দেশ্য বঞ্চনা বা দারিদ্রের মোকাবিলা করা, এবং তার জন্যে যেটুকু অসাম্য হ্রাস করা প্রয়োজন, ততটাই। এখন ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান কি হওয়া উচিত, তা স্থান ও কালের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু কোন বিশেষ স্থান ও কালে, রল্‌স্‌ যে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষের জীবনযাত্রার মান সর্বাধিক সম্ভব মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যর কথা বলছেন, সেখানে জীবনযাত্রার মানের ধারণাটা আপেক্ষিক (relative) নয়, অনাপেক্ষিক (absolute) ভাবা যেতেই পারে। তবে এই নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কেউ আবার মনে করতেই পারেন যে জীবনযাত্রার মানের ধারণাটাই একধরণের আকাঙ্ক্ষা (aspiration) থেকে তৈরি হয় এবং তাতে সমাজে স্বচ্ছল মানুষের জীবনযাত্রার মানের একটা প্রভাব থাকে। এইভাবে ভাবলে দারিদ্র বা বঞ্চনার একটা আপেক্ষিক দিক আছে, এবং এই ক্ষেত্রে অসাম্য নিয়েও ভাবতে হবে, কারণ সমাজ যত অসম হবে, তাতে এই আপেক্ষিক চাওয়া বাড়বে, এবং তার অভাবে জীবনযাত্রার মান বাড়াবার এক ইঁদুর দৌড়ে সবাই সামিল হয়ে যাবার সম্ভাবনা হবে, যাতে আখেরে সবারই ক্ষতি হতে পারে।

৪। অসাম্যের শিকড়

আমরা অসাম্য বা বঞ্চনা নিয়ে এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম, তা প্রধানত নৈতিক (normative) দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। সারা লেখাটায় “উচিত” শব্দটি কতবার ব্যবহার হয়েছে তার থেকেই তা বোঝা যাবে! এখানে প্রশ্নটা ন্যায্য-অন্যায্যের, কি কারণে অসাম্য বা বঞ্চনা বিভিন্ন অর্থব্যবস্থায় সৃষ্টি হয় তা নয়। সেইরকম অসাম্যের প্রতিকারের ক্ষেত্রেও আমাদের অবস্থানটা কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল । তার জন্যে রল্‌সের প্রস্তাবিত নিরপেক্ষ একটা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাপারটা আমরা দেখলাম। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কি ভাবে এই অসাম্যের প্রতিকারের নীতি বাস্তবে অবলম্বন করা হয়, সে ব্যাপারে আমরা কিছু বলিনি। কেউ বলতেই পারেন, ধরে নেওয়া হচ্ছে অজ্ঞানতার কুয়াশা সরে বাস্তবের রোদ উঠলে অজ্ঞানতার অন্ধকারে যে নীতি নির্বাচিত হবে, তা নিখুঁতভাবে রূপায়িত হবে। কিন্তু তার জন্যে যে প্রতিষ্ঠান (institutions) গুলো দায়ি, তারা তো রল্‌সের এই কাল্পনিক পরিকল্পনা কমিশনের মত লোভ-ভ্রষ্টাচার-পক্ষপাত-অন্যায়ের উর্ধে নয়। বাজারই হোক বা প্রশাসন, সরকারই হোক বা আইনব্যবস্থা, ক্ষমতাশালীদের প্রভাব থেকে কেউ মুক্ত নয়। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই । আমেরিকায় আয়করের সর্বোচ্চ হার হল ৩৫% আর পুঁজির বিনিয়োগের থেকে আয়ের (capital earnings) ওপর সর্বোচ্চ করের হার হল ১৫% । তাই, আদতে এই কর ব্যবস্থা প্রগতিশীল নয়, তার উল্টো। এই নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে ধনীদের একজন, ওয়ারেন বাফেট লিখেছেন যে

তাঁর মত আয়ের ওপর করের যে আনুপাতিক হার তা তাঁর সব কর্মচারীদের থেকে অনেক কম, কারণ তাঁর মোট আয়ের প্রায় সবটাই পুঁজির বিনিয়োগের থেকে। এর কারণ খুব সোজা। আইনি ও বেআইনি অনেক পথে ধনীদের রাজনৈতিক প্রভাব মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের থেকে অনেক বেশি। তাই গণতন্ত্রে প্রত্যেক মানুষের একটা করে ভোট থাকলেও, মানুষে মানুষে অনেক ফারাক আছে, সব মানুষ নয়কো সমান।

এই সমস্যাটা শুধু রল্‌সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মার্ক্স তাঁর আদর্শ সমাজের বর্ণনা করেছিলেন এমন এক ব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী দেবে, আর প্রয়োজন অনুযায়ী নেবে। এখানেও, এটা একটা নৈতিক বা আদর্শ অবস্থান। পরিবারের মধ্যে এইরকম একটা নীতির কথা ভাবাই যেতে পারে। গোটা সমাজ নিয়ে এই ভাবে ভাবা যেতে পারে কি না, সেটা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু সে কথা বাদ দিয়েও, সমাজতন্ত্রের যে চেহারা পূর্ব ইয়োরোপ বা চিনে আমরা দেখেছি, তার সাথে এই আদর্শের মিল খুব অল্প। সেখানেও, বাস্তবে নীতির যাদের হাতে রূপায়িত হত, তারা ক্ষমতা হাতে পেয়ে এই আদর্শের থেকে অনেক দূরে সরে গেছিল, ক্ষমতাবান আর ক্ষমতাহীনদের মধ্যে নতুন শ্রেণী বিভাজনের পত্তন হয়েছিল।

তার মানে কি এই আদর্শ নীতির আলোচনার কোন মূল্য নেই? [৮] আছে এই কারণে, যে এগুলো আমাদের একটা মানদণ্ড দেয় যা দিয়ে আমরা বাস্তবের হাজারো সমস্যাদীর্ণ বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে যা হতে দেখি তার মূল্যায়ন করতে পারি, বিভিন্ন প্রস্তাবিত নীতির মধ্যে তুলনামূলক বিচার করতে পারি। বাস্তব পৃথিবীর এবড়ো খেবড়ো রাস্তা দিয়ে চলার পথে যেমন মান চিত্রের প্রয়োজন হয় যেখানে পথঘাট সোজা, সরল, এবং নিখুঁত, বা অসুস্থ রোগীকে সারিয়ে তুলতে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের শরীরের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া বোঝার দরকার হয়, এক্ষেত্রে আদর্শ নীতি আলোচনার প্রয়োজনও অনেকটা একই রকম। আদর্শ পরিস্থিতির মধ্যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অসাম্যের দিকে দেখলে তার কতটা অধরা, কতটা অসহনীয়, আর কতটা অনিবার্য না বুঝতে পারলে তার সম্ভাব্য প্রতিকারের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে কি করে?

একটা কথা বলে শেষ করি। অসাম্যের ভাল-মন্দ বিচারে আমরা দেখেছি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমস্যাটা অসাম্য নয়, বঞ্চনা বা দারিদ্র নিয়ে। কিন্তু বাস্তব পৃথিবীতে অসাম্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ আছে। আর্থিক অসাম্য থেকে তৈরি হয় ক্ষমতা বা প্রভাবের অসাম্য। আর ক্ষমতার অসাম্য যত বাড়ে, আদর্শ নীতি আর বাস্তবে যে নীতি অবলম্বন করা হয় এবং রূপায়িত করা হয়, তাদের মধ্যে ফারাকও তত বাড়ে। এই ক্ষেত্রে সমস্যাটা শুধু দারিদ্র বা বঞ্চনার নয়, অসাম্যেরও।

তবে ধনতন্ত্রে ক্ষমতা আর আর্থিক স্বচ্ছলতার মধ্যে যেরকম সম্পর্ক, অন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থের জায়গায় সেটা অন্যকিছুর অধিকার বা মালিকানা হয়। যেমন, সামন্ততন্ত্রে জমির মালিকানা এবং বংশানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত মর্যাদা ও বিশেষাধিকার হল ক্ষমতার উৎস। তাই

আয় ও সম্পদের অসাম্য নিয়ে দুশ্চিন্তা করার জোরদার কারণ একটা আছে। টমাস পিকেটির সাম্প্রতিক বইয়ে আয় ও ধনের ক্রমবৃদ্ধিমান অসাম্য নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নতুন তথ্য এবং অস্বস্তিকর কিছু প্রশ্ন আছে। [৯] কিন্তু এখানেও প্রশ্ন হল, প্রতিকারের উপায় কি - করের হার বৃদ্ধি না কি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলোর সংস্কার যাতে সরকারি নীতির ওপর ধনীদের প্রভাব হ্রাস পায়, না কি দুটোই ? না কি এই সমস্যাগুলোর প্রতিকার নেই, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এগুলো অবশ্যম্ভাবী উপসর্গ ? এই সব প্রশ্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধের পরিধির বাইরে। কিন্তু তাদের গুরুত্ত্ব অস্বীকার করা যায়না । আমাদের প্রতিদিনের জীবনে, অর্থনীতি বা রাজনীতি সব ক্ষেত্রেই ক্ষমতার অসাম্যের বিষময় ফলের উদাহরণ আমাদের চারপাশে। খুব আদিম নানা সংঘাত আমাদের চারপাশে অহরহ ঘটে চলে, যা মূলত জোরজবরদস্তি করে দরিদ্রের নামমাত্র সম্বল (তা জমিই হোক, বা প্রাকৃতিক সম্পদ) কবজা করার জন্যে ধনীর অক্লান্ত প্রয়াস। আইন আছে, রাষ্ট্রব্যবস্থা আছে, রাজনৈতিক দল আছে, কিন্তু এই সব ক্রীড়াঙ্গনও তো সমতল নয় - এখানেও সুযোগের অসাম্য প্রবল।

ক্ষমতার অসাম্যের সাথে আয় বা সম্পদের অসাম্যের সম্পর্ক, এবং তার কার্যকারণ ও সম্ভাব্য প্রতিকার বোঝা অবশ্য প্রয়োজনীয়। তা নিয়ে পরে কখনো বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছে রইল। কিন্তু প্রথমে বোঝা দরকার, আদর্শ ব্যবস্থা আমাদের আয়ত্তে থাকলে আমরা কি চাইতাম। অর্থাৎ, ফিরে যেতে হবে জন্মের আগের সেই কুয়াশাঘেরা প্ল্যাটফর্মে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার - এই লেখার বিষয়বস্তু নিয়ে মনীষিতা দাশ, অমিতাভ গুপ্ত, ও দেবরাজ রায়ের সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। মনীষিতা দাশ লেখাটা পড়ে অনেক মূল্যবান পরামর্শও দিয়েছেন।

অন্তটিকা

১। এই কারণে পরিবার তৈরি হওয়ার সময়েই এক পরিবারের সঙ্গে অন্য পরিবারের বৈষম্যও তৈরি হচ্ছে। বংশগতির প্রভাব যদি বাদও দিই, মা-বাবা শিক্ষিত হলে সন্তানও শিক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। শিক্ষিত সন্তান পরে বিয়ের বাজারে গেলে তার সমযোগ্য সঙ্গীই পাবে এবং পরবর্তী প্রজন্মও তার সুফল পাবে ।

২। এই নিয়ে "উন্নয়নের সূচক নিয়ে বিতর্ক সংখ্যাডোরে যায়না যারে বাঁধা -?" (*বারোমাস*, বড়দিন সংখ্যা, ২০১৩) আলোচনা করেছি।

৩। উদারবাদী (liberal) আর অতি-উদারবাদীদের (libertarian) মধ্যে ফারাক হল, দুই পক্ষই ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী কিন্তু প্রথম মতধারায় সেই স্বাধীনতারক্ষায় সরকারের বড় ভূমিকা আছে, আর দ্বিতীয় মতধারায়, সরকারের ভূমিকা যত কম হবে ততই মঙ্গল বলে মনে করা হয়। আরেকটা তফাৎ হল, উদারবাদীরা সুযোগের সাম্যের জন্যে সরকারের সক্রিয় ভূমিকা মেনে নেন, আর অতি-উদারবাদীরা জোর দেন ব্যক্তির জীবনে যে কোনধরণের হস্তক্ষেপেরই (তার মধ্যে সুযোগের সাম্য বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় পুনর্বণ্টনও পড়ে) বিরোধীতায়।

৪। অতি-উদারপন্থীরা (যেমন, রবার্ট নজিক) অনেক সময় সরকারের তরফ থেকে আয়-কর এবং বাধ্যতামূলক শ্রম দাবি করার মধ্যে কোন ফারাক নেই বলে দাবি করেন। এই নিয়ে তাঁর বিখ্যাত বই *Anarchy, State, and Utopia* (Oxford: Basil Blackwell, 1974) দ্রষ্টব্য। এর বিপক্ষে দুটি যুক্তি আছে। প্রথমত, আয় হল শ্রমের ফলাফল, এবং করের কারণে কেউ যদি কম পরিশ্রম করতে চান তাঁর সে অধিকার আছে, যা বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয়ত, কি ভাবে কোন পেশায় শ্রম নিয়োজিত হবে তা নির্ধারণ করার অধিকার থাকলে, তা অর্থনৈতিক দক্ষতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা, দুই দিক থেকেই বাধ্যতামূলক শ্রমের চাইতে শ্রেয়।

৫। এই নিয়ে রল্‌সের A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা আছে। রল্‌সের তত্ত্ব এবং তার সমালোচনা নিয়ে অমর্ত্য সেনের "Equality of What" (Tanner Lecture on Human Values, Stanford University, 1979) প্রবন্ধটি অবশ্যপাঠ্য। তাঁর "সামর্থ্য তত্ত্বের" (capability theory) ধারণাটা রল্‌সের তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু সেনের মূল বক্তব্য হল, সবার আয়ত্তের মধ্যে ন্যূনতম পরিমাণ প্রাথমিক পণ্য নিয়ে আসার লক্ষ্যটা যথেষ্ট নয়, কারণ এগুলো ব্যবহার করতে পারার ক্ষমতার মধ্যে মানুষে মানুষে তফাৎ আছে। যেমন, একই পরিমাণ প্রাথমিক পণ্য পেলে একজন শারীরিকভাবে স্বাভাবিক মানুষ এবং এক জন প্রতিবন্ধী মানুষের জন্যে আলাদা করে ভাবতে হবে। তাই সেনের মতে "পণ্যের" পরিমানের ওপর মনোনিবেশ না করে এই পণ্য ব্যাবহার করে একজন মানুষের সামর্থ্য কি দাঁড়াচ্ছে সেটার ওপরেই নজর দেওয়া উচিত। খুব সরল করে বললে, যাতায়াতের অবাধ অধিকার এবং ন্যূনতম অর্থের ব্যবস্থা করে দিলে বাকিটা একজন ভ্রমণপিপাসী শারীরিকভাবে স্বাভাবিক মানুষের হাতে ছেড়ে দিলেই যথেষ্ট, কিন্তু একই মানসিকতার আরেকজন মানুষ, যিনি পঙ্গু, তাঁর ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট নয়। তাঁর ভ্রমণ সুগম করার জন্যে বাড়তি কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। সুত্র : Mahatma Gandhi, *Last Phase,* Vol. II (1958), p. 65.

৭/ আর একটা জিনিস খেয়াল করার মত - সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষের থেকে যারা এগিয়ে আছে (আমরা তো দেখেছি অর্থনৈতিক দক্ষতার খাতিরে রল্‌স্ তো খানিকটা অসাম্য মেনে নিতে রাজি), তাদের মধ্যে অসাম্য নিয়ে রল্‌সের কোন বক্তব্য নেই।

৮। হয়তো নেই, কিন্তু এতো বড় প্রবন্ধের শেষে এসে আমি তো আর তা বলতে পারিনা (লেখার আগে অজ্ঞানতার অবগুণ্ঠনের আড়ালে চলে যেতে পারলে না হয় অন্য কথা হত)।

৯। সুত্র : Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, Belknap Press/Harvard University Press, 2014.